চিরযৌবন প্রাইভেট লিমিটেড

অনীশ দেব



চিরযৌবন প্রাইভেট লিমিটেড

অনীশ দেব



ছবি : সুদীপ্ত মণ্ডল

তিতিয়া ফোনে কথা বলছিল বলে ভদ্রলোককে খেয়াল করেনি। কিন্তু রীতেশকে ঝাঁঝিয়ে উঠে মাথা ঝাঁকাতেই তেরছা নজর পড়েছে ভদ্রলোকের দিকে।

একটা পার্কে বসেছিল তিতিয়া। বিশাল পার্কের সীমানা ঘেঁষে সবুজ ঘাস। সেই ঘাসের ওপরে বেশ খানিকটা দূরে-দূরে বসানো কাঠের তৈরি কয়েকটা সাবেকি বেঞ্চ। সেরকমই একটা বেঞ্চের এক কোণে বসেছিল ও। কাঁধে কালো হ্যান্ডব্যাগ।

যখন ও এসে বসে তখন বেঞ্চে আর কেউ ছিল না। কিন্তু এখন খেয়াল করল, এই সৌম্য চেহারার বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেঞ্চের অন্য প্রান্তে বসে আছেন। কখন এসে বসলেন কে জানে!

মোবাইল ফোন কানে চেপে ধরে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে রীতেশের সঙ্গে ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছিল তিতিয়া। আজ ও একটা এসপার কি ওসপার করে ছাড়বে। তাতে রিলেশান থাকলে থাকবে, না থাকলে না থাকবে। একেবারে কাটিং-কাটিং কাট্টি।

'নো—নো, স্টপ ইট, রীতেশ। আই জাস্ট ওয়ন্ট টু নো যে তুমি মনসুনের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলে কি না। না, না—ওর ফ্ল্যাটে ও একা থাকে, না একগুষ্টি রিলেটিভ থাকে সেটা জেনে আমার কোনও লাভ নেই। মাই পয়েন্ট ইজ, বারবার তোমাকে বারণ করা সত্ত্বেও ইউ ওয়েন্ট টু হার প্লেস। তো গেলে যখন রাতটা কাটিয়ে এলেই পারতে! নো, ডোন্ট "কুল ডাউন, বেবি" মি। তুমি ভালো করে জানো—আই টোল্ড ইউ মেনি টাইম্‌স ওভার—যে, মনসুনটা বেসিক্যালি ছেলে-হ্যাংলা। মোরওভার, তোমার ওপর ওর একটা ক্রাশ আছে।... হেসো না, হেসো না। হেসে ব্যাপারটাকে লাইট করার চেষ্টা কোরো না। ইট্‌স আ ফাকিং সিরিয়াস ইস্যু...।'

তিতিয়ার কথার তোড়ে রীতেশ ওর কথাগুলো ঠিকঠাকভাবে বলে উঠতে পারছিল না। বলতে গিয়ে রীতিমতো খাবি খাচ্ছিল। তিতিয়ার কথার স্পিড কোনও রেডিয়ো জকিকেও হার মানাবে। তিতিয়াটা এইরকমই—পটাস করে রেগে যায়। আর ওর টেম্পারেচার একবার বয়েলিং পয়েন্টে উঠে গেলে সেটাকে অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচারে নামিয়ে আনা মুশকিল। শুধু এইটুকু নেগেটিভ ব্যাপার ছাড়া ওর বাকি সব কিছু দারুণ পজিটিভ। সেইজন্যই রীতেশ ওর প্রেমে হাবুডুবু খায়। এবং এর উলটোটাও সত্যি। রীতেশ সেটা জানে। আউটরাম ঘাটের সন্ধ্যায় বা সিনেমা হলে রীতেশ যখন তিতিয়াকে আদর করে তখন ও যেমন রীতেশের দিকে ঘন হয়ে আসে, আদর খায়, তেমন রীতেশকেও পালটা আদরে পাগল করে দেয়। আর পাগলিটা আদর করতে জানে বটে! ওর আদরের কোনও রুল-টুল নেই।

কিন্তু ওই—একবার মট্‌কা গরম হয়ে গেলে...।

হঠাৎই তিতিয়ার কথার মাঝে একটু ফাঁক পেয়ে গেল রীতেশ। বাসে ছ'জনের সিটে জোর করে সাত নম্বর মানুষটাকে বসাতে গেলে যেটুকু ফাঁক পাওয়া যায় অনেকটা সেইরকম।

রীতেশ মুহূর্তের মধ্যে মনে-মনে 'জয় মা!' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর কথাগুলো তিতিয়াকে তো বলতেই হবে! নইলে মেয়েটা হয়তো ওর ওপরে সুপার-অ্যাংরি হয়েই থাকবে।

'তিতিয়া, লুক—' রীতেশ হাইস্পিডে বলতে শুরু করল, 'মনসুনের কাল একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। লেফ্‌ট লেগে হেভি জোর চোট পেয়েছে। হাঁটতেই পারছে না। আমরা তিনজন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছিলাম। আমাদের সঙ্গে রাজন ছিল। ইউ নো রাজন? ভেরি ডিসেন্ট চ্যাপ—খুব হেল্‌পফুল। বাট ওর একটা ইমার্জেন্সি কাজ ছিল, তাই ও তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমার কোনও ফল্ট নেই। অনেস্ট্‌লি বলছি—।'

'চমৎকার! ডিসেন্ট অ্যান্ড হেল্‌পফুল রাজন চলে গেল বলে ইউ বিকেম দ্য ডিসেন্ট হেল্‌পফুল গাই! শালা, আমাকে চকমা দিচ্ছিস! তোকে বহুবার বলেছি মনসুনের দশ ফুট রেডিয়াসের মধ্যে থাকবি না। পায়ে হার্ট হয়েছে বলে তুই ওকে বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেলি! তোর একবারও আমার কথা মনে পড়ল না!' তিতিয়া পরিচয়ের শুরু-শুরুতে রীতেশকে 'তুই-তুই' করে বলত—পরে 'তুমি'-তে শিফ্‌ট করেছিল। কিন্তু যখন ও খেপে যায় তখন আবার 'তুই-তুই'।

'মনসুন ওয়জ সিরিয়াসলি উন্ডেড। বিলিভ মি—।'

'কেন, ওকে কি ফুল পাঞ্জাব ট্রাক ধাক্কা মেরেছে, নাকি পাঞ্জাব মেল?' তিতিয়া রাগে গরগর করছিল।

'সাইকেল—।' মিউমিউ করে রীতেশ বলল।

'সাইকেল! আ ফাকিং সাইকেল! আর তুইও মাদার টেরিজা হয়ে চললি তাকে বাড়ি পৌঁছোতে! রীতেশ, আই জাস্ট কুড্‌ন্ট বিলিভ ইট! আমি একটা দিন ইউনিভার্সিটি মিস করেছি, আর সেই ফাঁকে তুই...।'

'তিতিয়া, ডোন্ট ইউ গেট মি রং...।'

'আমি দুবার তোকে ফোন করেছিলাম—তুই ধরিসনি, আর ফোন ব্যাকও করিসনি—।'

'আমি রাস্তার ট্র্যাফিকের নয়েজে শুনতে পাইনি—গড প্রমিস।'

'কী করে ফোন তুলবি? তুই তো তখন মনসুনের পেইন রিলিফের জন্যে ওকে মাসাজ করছিস!'

'তুমি এখন কোথায়, তিতিয়া? শিগগির বলো। আমি তোমার কাছে আসছি। আই ওয়ন্ট টু এক্সপ্লেইন এভরিথিং টু ইউ। আই আর্নেস্ট্‌লি রিকোয়েস্ট ফর আ লাস্ট চান্স। ওয়ান আখরি চান্স। প্লিজ...। বলো, তুমি কোথায় আছ?'

'বলব না! অ্যান্ড ডোন্ট ইউ এভার ট্রাই টু কল মি। ইউ হ্যাভ ফান উইথ মনসুন। অ্যান্ড ফাক অফ ফ্রম মাই লাইফ...।'

ফোন কেটে দিল তিতিয়া। তারপর বোতাম টিপে ফোন অফ করেও দিল। এবং ফোনটা ওর হ্যান্ডব্যাগের ভেতরে ফেলে দিল।

গুম হয়ে বেঞ্চের কোণে বসে রইল। ওর কান দিয়ে যেন ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। ওর চোখের সামনে মনসুনের ন্যাকা মুখটা ভেসে উঠছিল। আর দেখতে না চাইলেও রীতেশের সরল মুখটা বারবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল।

শরৎকালের ঝকঝকে বিকেল। বিকেলের রোদ পার্কের গাছপালা আর বিশাল মাঠের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঠে বড়-বড় ছেলেরা ফুটবল খেলছে। তারই একপাশে ঘাসে ছাওয়া জায়গায় ছোট-ছোট ছেলেরা ফুটবল কোচিং-এর ক্লাস করছে। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ওদের প্র্যাকটিস করাচ্ছেন।

মাঠ ঘিরে রয়েছে ছোট-বড় নানান গাছ। আর তারই মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সরু পিচের রাস্তা। রাস্তায় স্বাস্থ্যসচেতন বেশ কয়েকজন মানুষ চটপটে পায়ে হাঁটাহাঁটি করছেন।

পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছিল তিতিয়া। গাছের সবুজ পাতা আর নানান রঙিন ফুল দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু এইসব সুন্দর উপকরণগুলো ওর মন ছুঁতে পারছিল না। কারণ, রীতেশ আর মনসুনের এপিসোডটা ওর মাথার মধ্যে হাইস্পিডে হিজিবিজি কাটছিল। কী ভেবে এই সুন্দর পার্কটায় ও এসেছিল, আর কী হয়ে গেল! ভেবেছিল, রীতেশকে এই পার্কটার কথা জানাবে— তারপর ওকে ফোন করে এখানে ডেকে নেবে। পার্কটার একটা ফরম্যাল নাম থাকলেও সবাই এটাকে 'লাভার্স পার্ক' বলে জানে। এই পার্কে ওদের দুজনের সুন্দর রোম্যান্টিক সময় কাটবে এটাই ভেবেছিল তিতিয়া। কিন্তু রাজন ওকে ফোন

করে গতকালের এপিসোডটা খুব সংক্ষেপে জানায়। রাজন মুখচোরা—খুব কম কথা বলে। ও শুধু এটুকু বলেছে যে, কাল মনসুন ছোট একটা অ্যাক্সিডেন্টে চোট পেয়েছে। রাজনের একটা ইমার্জেন্সি কাজ ছিল বলে ও মনসুনকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারেনি। লাকিলি রীতেশ ওদের সঙ্গে ছিল। হি হেল্প্‌ড মনসুন—হি ওয়জ সো গুড। রাজন ওদের সঙ্গে থাকতে পারেনি বলে বারবার দুঃখ করছিল।

ব্যস—তখনই সুন্দর বিকেলটা শেষ হওয়ার শুরু।

'মা-মণি, তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ জানি—তোমার বুকের ভেতরে নিশ্চয়ই ঝড় চলছে। তবু একটা কথা বলি...।'

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তিতিয়া। কথাগুলো বলেছেন বেঞ্চের অন্য প্রান্তে বসে থাকা বৃদ্ধ মানুষটি।

তিতিয়ার চোখের কোণে জলের ফোঁটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ও চট করে দু-চোখের কোণে রুমাল ছুঁইয়ে নিল। তারপর বৃদ্ধ মানুষটিকে ভালো করে দেখল।

ফরসা রোগা চেহারা। মাথায় ধবধবে সাদা চুল। বয়েসের চাপে কপালের দুপাশে চুল অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। চোখে সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা। চশমার ওপরে কাঁচাপাকা ভুরু। আর কাচের আড়ালে দুটো আন্তরিক উজ্জ্বল চোখ। চোখের নজরে স্মিত হাসি। ঠোঁটের ওপরে কাঁচাপাকা গোঁফ। পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো।

ভদ্রলোকের পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা। ওগুলো গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। পাঞ্জাবির হাতা দুটো সামান্য গোটানো। বাঁ-হাতের কবজিতে স্টিল ব্যান্ডের ঘড়ি। ডানহাতের মধ্যমায় ঝিকিমিকি পাথর বসানো একটা আংটি।

ভদ্রলোকের বয়েস বোধহয় ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। কিন্তু ওঁর চামড়া বেশ টানটান, উজ্জ্বল। চুলের রং ধবধবে সাদা না হলে মানুষটাকে অনেক কমবয়েসি ভাবার সুযোগ ছিল।

তিতিয়া ভদ্রলোককে বেশ খুঁটিয়ে দেখছিল। কখন যে উনি বেঞ্চের ওই কোনায় এসে বসেছেন কে জানে! হয়তো তিতিয়ার সব কথাই শুনেছেন। এখন কী বলবেন গড নোজ!

'তোমার কথাবার্তা আমি অনেকটাই শুনেছি—মানে, শুনে ফেলেছি। না, না—তার জন্যে তোমার অস্বস্তি পাওয়ার কোনও দরকার নেই। কারণ, আমার বয়েস তোমার বয়েসের অন্তত আড়াই কি তিন গুণ। তা ছাড়া রোজ ব্যাবসার কাজ থেকে ছুটি নিয়ে বিকেল চারটে-সাড়ে চারটে নাগাদ এই বেঞ্চের ঠিক এই কোনটায় আমি এসে বসি। আজ এসে তোমাকে দেখতে পেলাম...।'

ভদ্রলোকের গলা বেশ ইমপ্রেস করার মতো। যাঁরা আবৃত্তি-টাবৃত্তি করেন কিংবা খবর পড়েন, অনেকটা তাঁদের মতন।

তিতিয়া ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ছিল। কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

'জানি—একটা অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে তোমার অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু এটা জেনে রাখো যে, মানুষ হিসেবে আমি খুব সেফ। কারণ, আমার এমন একটা অসুখ হয়েছে যেটা সারিয়ে তোলার কোনও চিকিৎসা নেই। তবে খানিকটা লড়াই-টড়াই করা যায়—ক্যান্সারের মতন।'

কথা বলতে-বলতে ভদ্রলোকের দৃষ্টিটা কেমন উদাস হয়ে গেল। দূরের গাছপালা আর আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তবে আকাশের লালচে রং দেখতে পাচ্ছিলেন কি না বোঝা গেল না।

তিতিয়ার ভেতরে ঝগড়ার তাপ কমে আসছিল। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কেমন একটা মায়া হল। ক্যান্সারের মতন অসুখ? কী অসুখ হতে পারে সেটা? তিতিয়া মনের ভেতরে হাতড়াল—এরকম কোনও অসুখের নাম ও কি কখনও শুনেছে?

'কী অসুখ হয়েছে আপনার?' তিতিয়াকে অবাক করে ওর ঠোঁট থেকে এই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

'রোগটার নাম "ম্যাকমিলান্'স সিনড্রোম"। এই রোগের সেরকম কোনও ট্রিটমেন্ট নেই। তবে লড়াই করে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে একটা ট্যাবলেট খাই—দিনে দুবার—"সি-টক্স-এফ", ওয়ান ফিফ্‌টি এম-জি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক। তারপর : 'এ ছাড়া একটা ইনজেকশান আছে...। যাকগে, যে-কথাটা তোমাকে গায়ে পড়ে বলতে যাচ্ছিলাম—' তিতিয়ার দিকে সামান্য ঘুরে বসলেন ভদ্রলোক। ঠোঁট চওড়া করে একটু হাসলেন : 'রীতেশ তোমার বয়ফ্রেন্ড নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ—' মাথা নাড়ল তিতিয়া : 'বাট হি ওয়জ মাই বয়ফ্রেন্ড—নট এনিমোর।'

'ওয়জ' শব্দটার ওপরে জোর দিল তিতিয়া। ওর মুখ শক্ত হল, ঠোঁট শক্ত হল।

ভদ্রলোক এবার শব্দ করে হাসলেন। আপনমনে মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ।

'এখনও দেখছি রীতেশের ওপরে তোমার রাগ কমেনি। তুমি কি বিশ্বাস করবে, মা-মণি, আমাদের লাইফে এই ঝগড়া আইটেমটা ভীষণ জরুরি?'

তিতিয়ার কৌতূহল হল। জিগ্যেস করল, 'কেন? জরুরি কেন?'

'বিকজ ঝগড়া না হলে আড়ি হবে না। আর আড়ি না হলে ভাবের মজা, ভাবের আনন্দ, ভাবের সৌন্দর্য কেউ টের পাবে না।' একটু থামলেন। তারপর : 'সেইজন্যেই বলছি, একটু ঝগড়া হলেই ভাবতে নেই যে, রিলেশান শেষ। ঝগড়ার পর ভাব হওয়ার ব্যাপারটাই কোনও রিলেশানের জেনুইন বিউটি। আমার বউয়ের সঙ্গে তো আমার কত ঝগড়া হত—' ভদ্রলোক আবার উদাস চোখে আকাশ- বাতাসের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর : 'ঝগড়া হত, আবার ভাবও হত। "হত", কারণ, সাড়ে ন' বছর হল সুমিতা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। খুব মিস করি ওকে। সবসময় ওর কথা মনে পড়ে। আমাদের ঝগড়াগুলো খুব সুইট ছিল। ভাবগুলো তো আরও সুইট।

'তো ভাবের সুইটনেস যদি তুমি রেলিশ করতে চাও তা হলে আমার রিকোয়েস্ট, রীতেশের সঙ্গে রিলেশানটা তুমি কিছুতেই শেষ কোরো না। তুমি বোধহয় তোমার ফোনটা অফ করে দিয়েছ—না হলে দেখতে এতক্ষণে চার-পাঁচবার রীতেশের ফোন এসে যেত...।'

তিতিয়ার এবার একটু বিরক্ত লাগছিল। ওর পার্সোনাল ব্যাপারে ভদ্রলোক এরকম নাক গলিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?

ভদ্রলোক বোধহয় তিতিয়ার মনের কথা বুঝতে পারলেন। মাথাটা সামনে একটু ঝুঁকিয়ে

বললেন, 'মনে-মনে ঠিকই ভেবেছ, মা-মণি। আমি একজন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, আমি কেন তোমার পারসোনাল ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি।' হঠাৎই মুখ তুলে বললেন, 'আচ্ছা, তোমাকে ''তুমি'' বলছি বলে রাগ করছ না তো?'

একটু লজ্জা পেয়ে তিতিয়া হেসে বলল, 'না, না—রাগ করব কেন? আপনি কত সিনিয়ার...।'

'তোমার পারসোনাল ব্যাপারে আমি নাক গলাচ্ছি কেন জানো?' সরাসরি তিতিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার এই টার্মিনাল অসুখটার জন্যে। ডাক্তাররা আমাকে পাঁচমাস মতো টাইম দিয়েছেন...বড়-জোর ছ' মাস। তারপরই আমার পৃথিবীর ট্যুর শেষ। তখন তো এই লাভার্স পার্কও আর দেখতে পাব না, আর তোমার সঙ্গেও আর দেখা হবে না। তাই রোজ পার্ক থেকে চলে যাওয়ার সময় আমি এইসব গাছপালা, ফুল, পাখি, সেটিং সান—সব্বাইকে মনে-মনে ''গুড বাই'' বলি। কারণ, ওদের সঙ্গে আর আমার দেখা নাও হতে পারে।

'আর তোমার ব্যাপারেও, মা-মণি, আমি নাক গলিয়েছি এই হতচ্ছাড়া অসুখটার জন্যে। আমি চাই এই পৃথিবীতে দুঃখ আর না থাকুক, সবার সঙ্গে সবার ভাব হয়ে যাক, সব রিলেশান সুইট হয়ে উঠুক। জানো তো, এই দুনিয়ায় তিনকুলে আমার কেউ নেই। কোনও রিলেটিভ নেই, কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। সেইজন্যেই রিলেশানের দাম আমার কাছে অনেক বেশি বলে মনে হয়। তার ওপর আমার আর পাঁচ-ছ' মাসের আয়ু বাকি। হয়তো সেইজন্যেই...।'

তিতিয়া খুব অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। একইসঙ্গে একটু অপরাধবোধও টের পেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও জিগ্যেস করল, 'এই ''ম্যাকমিলান্'স সিনড্রোম'' অসুখটা আসলে, মানে, এগজ্যাক্টলি কীরকম? এই অসুখ হলে কী অসুবিধে হয়?'

ভদ্রলোক পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকালেন। বড়-বড় গাছগুলোর মাথায় লালচে সূর্য। হয়তো আধঘণ্টা পরেই সূর্য গাছের আড়ালে চলে যাবে। আকাশ নানান রঙের তুলির আঁচড় কেটে সূর্যাস্তের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। মরা বিকেলের আলো ভদ্রলোকের ফরসা মুখের একপাশে পড়ে হাইলাইট তৈরি করেছে।

বড় ছেলেদের দল এখনও ফুটবলের পিছনে ছুটোছুটি করছে। বাচ্চা ছেলেগুলোর কোচিং ক্লাস শেষ। ওরা বাবা-মায়ের হাত ধরে মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

একটু দূরেই পার্কের মেন গেট। মেন গেটের দুপাশে ঝালমুড়িওয়ালা, ফুচকাওয়ালা, ঘুগনিওয়ালা দোকান সাজিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের কাছে দু-চারজন করে খদ্দেরের ভিড়।

মেন গেটের বাইরে বড় রাস্তা চোখে পড়ছে। সেখানে এদিক-ওদিক গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। মেন গেটের পাশে ফুটপাথ ঘেঁষে দুটো হলদে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বড়-বড় দুটো শ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক।

'দ্যাখো, মা-মণি—তোমার অনেক পারসোনাল কথা আমি শুনে ফেলেছি। তার জন্যে তোমাকে ''সরি'' বলছি। আর ইন কমপেনসেশান, তোমাকে আমার পারসোনাল কথা বলছি।' কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর ঃ 'আমার নাম শেখরচন্দ্র দত্তগুপ্ত। আমি বিড্ন স্ট্রিটে—মানে, কাছাকাছিই থাকি। যে-বাড়িতে থাকি সে-বাড়িটা আমার নিজের—যদিও অনেক পুরোনো। আগেই তোমাকে বলেছি, আমার ওয়াইফ অনেক বছর হল মারা গেছে, আর আমাদের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। তাই আমি একা। একেবারে একা। তবে দেখাশোনার জন্যে, ফাইফরমাশ খাটার জন্যে রাতদিনের একটি মেয়ে আছে—নাম, মৌরী।

'আমার অসুখটা ধরা পড়েছে বছর দুয়েক হল। এই অসুখে যেটা হয়, শরীরে হঠাৎ করে কাঁপুনি শুরু হয়। সাংঘাতিক কাঁপুনি—তবে সে-কাঁপুনি মৃগীরোগের মতন নয়। বরং অনেকটা ম্যালেরিয়ার জ্বরের মতো। তফাত হল, এই কাঁপুনি শরীরের বাইরেও হয়, ভেতরেও হয়। বিশেষ করে হার্ট আর লাংস থরথর করে কাঁপতে থাকে। টেরিব্‌ল থ্রবিং যাকে বলে। এ ছাড়া বাইরের কাঁপুনি দশ-পনেরো মিনিট পরে থেমে গেলেও ভেতরের কাঁপুনিটা হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে চলতে থাকে। অ্যাজ আ রেজাল্ট, হার্ট আর লাংস ড্যামেজ হয়। রোগের শুরুতে থ্রবিং ফ্রিকোয়েন্সি যা থাকে, দিনের পর দিন সেটা ধাপে-ধাপে বাড়তে থাকে। আমার ক্ষেত্রে সেই ফ্রিকোয়েন্সি এখন ''কিলার ফ্রিকোয়েন্সি'' ব্যান্ডে পৌঁছে গেছে। এই ফ্রিকোয়েন্সি ''মর্টাল'' লেভেল রিচ করতে রাফ্‌লি চারমাস কি পাঁচ- মাস নেয়। তারপর... তারপর...' পশ্চিমের আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন শেখরচন্দ্র ঃ 'ওই সূর্যাস্তের মতো—দ্য এন্ড।' কথা থামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হতাশায় মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ।

'ওই কাঁপুনিটা কোন সময়ে হয়?' মানুষটাকে নিয়ে তিতিয়ার কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছিল।

'ওটার সময়ের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। তবে দিনে দুবার কি তিনবারের বেশি হয় না...।'

'যখন হয় তখন কী করেন? ওটা তো যখন-তখন হতে পারে—মানে, রাস্তাঘাটেও হতে পারে...।'

'হ্যাঁ, হতে পারে। এই যে পার্কে বসে আছি, এখনও হঠাৎ করে হতে পারে। বিকেলবেলা, পার্কে যখন বসে থাকি, তখন ওই ভয়ংকর থ্রবিং-এর ব্যাপারটা হয়েছে এ পর্যন্ত মাত্র তিনবার। ওটা তো আর আগেভাগে জানান দিয়ে হয় না!' শেখরচন্দ্র মাথার চুলে একবার হাত বোলালেন। ডান-পকেটে হাত ঢোকালেন। মনে হল, কিছু একটা জিনিস ছুঁয়ে যেন নিশ্চিন্ত হলেন। ওঁর নাকে পার্কের সবুজের গন্ধ এল। বাঁচার ইচ্ছেটা আরও তীব্র হল।

তিতিয়া ওর শেষ প্রশ্নটার উত্তর পায়নি। তাই আবার জিগ্যেস করল, 'যখন ওই ''কিলার ফ্রিকোয়েন্সি''-র থ্রবিংটা হয় তখন কী করেন?'

'একটা ইন্‌জেক্‌শান নিই। যেটার কথা তোমাকে আগে বলছিলাম। খুব পেইনফুল ইন্‌জেক্‌শান। নিজে-নিজেই নিতে পারি। অবশ্য অন্য কেউ নিড্‌লটা পুশ করে দিলে খানিকটা সুবিধে হয়।'

'কী ইনজেক্‌শান নেন?'

'''থায়াটোমিন—টি. এস.।'' এটা শরীরে নেওয়ামাত্রই কাঁপুনিটা কমতে শুরু করে।

ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন। তিতিয়া যেন একটা ঘোরের মধ্যে ওর বাঁ-হাতটা টানটান করে ধরল। ওর কনুইয়ের ভাঁজের কাছে একটা শিরা আঙুল দিয়ে দেখালেন শেখরচন্দ্র ঃ 'এই যে, আমার হাতে ঠিক এই ভেইনটায়... সিরিঞ্জটা কাত করে...ঠিক এইভাবে, লো অ্যাঙ্গেলে...।' ইন্‌জেকশন পুশ করার ডেমো দিচ্ছিলেন বৃদ্ধ ঃ 'লো অ্যাঙ্গেলে ধরে...পুশ করে দেবে...। জাস্ট এইভাবে...।'

ডেমো দিতে-দিতে বেশ কাঁপছিলেন শেখর। কিন্তু হঠাৎই একপলকে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে গেলেন এবং তিতিয়ার হাতের শিরায় চট করে সিরিঞ্জের ছুঁচটা ঢুকিয়ে ওষুধটা সিঙ্গল অ্যাকশনে পুশ করে দিলেন। একটা গরম স্রোত ছড়িয়ে গেল তিতিয়ার শিরা-উপশিরায়।

শেখরচন্দ্র তিতিয়ার দিকে তাকিয়ে ধূর্ত হাসলেন। ওঁর মুখটা হঠাৎ কেমন পালটে গেছে। চাপা গলায় বললেন, 'শিকার ধরার কাজটা শেষ হল।' সিরিঞ্জটা বের করে নিয়ে ওটার ছুঁচের মাথায় প্রোটেকটিভ ক্যাপটা পরিয়ে দিলেন আবার। তারপর সিরিঞ্জটা চালান করে দিলেন পকেটে। হাতে হাত ঘষে তিতিয়ার দিকে তাকালেন। ওকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

তিতিয়া দেখল, বৃদ্ধ আর মোটেই কাঁপছেন না। দিব্যি স্বাভাবিকভাবে বেঞ্চে বসে রয়েছেন। ওঁর চোখের কোণে হাসির ছোঁয়া।

তিতিয়ার ভেতরে-ভেতরে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। অনেকগুলো খারাপ শব্দের স্রোত ওর মুখ দিয়ে বেরোতে চাইল—কিন্তু একটা শব্দও বেরোল না। কারণ, ও টের পেল, ওর জিভটা অসাড় হয়ে গেছে—ও আর সেটা নাড়াতে পারছে না। ঠোঁট জোড়ার অবস্থাও একই—নড়ার বদলে তিরতির করে কাঁপছে শুধু।

তিতিয়া যখন কথা বলতে পারল না, তখন শয়তান লোকটাকে ওর কষে একটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সেটাও সম্ভব হল না—কারণ, ডানহাতটাকে ও একটুও নাড়াতে পারল না।

শেখরচন্দ্র তিতিয়ার কাঁধ থেকে হ্যান্ডব্যাগটা হাতে নিলেন। তারপর ওর হাত ধরে খুব সাবধানে ওকে পাশে বসালেন।

'শোনো, বিউটিফুল তিতিয়া—এই মেডিসিনটা শরীরে গেলে প্রথমেই যেটা হয় সেটা হল ''মাল্‌টিমনোপ্লেজিয়া''। এতে বডির নানান জায়গায় প্যারালিসিসের এফেক্ট দেখা দেয়। অর্থাৎ, সেইসব জায়গার মাস্‌লগুলোর সঙ্গে ব্রেনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, যোগাযোগের নার্ভগুলো টেম্পোরারিলি অকেজো হয়ে যায়। তোমার এখন যেটা হয়েছে। এটাকে পরিভাষায় ''কম্পাউন্ড স্ক্লিরোসিস'' বলে।

'এ ছাড়া আরও যেটা হয়েছে, মা-মণি... তোমার ব্রেনটা এখন ডিজি হয়ে গেছে। ফাজিও বলতে পারো। একটা হিপনোটিক এফেক্ট তোমার ওপরে চেপে বসেছে। এখন আমি যা বলব তুমি তা অক্ষরে-অক্ষরে শুনবে—পোষা কুকুরের মতো। এখন থেকে আমার চাওয়াটাই তোমার চাওয়া।

'চলো, এবার যাওয়া যাক।' শেখর দত্তগুপ্ত বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিতিয়ার হাত ধরে আলতো টান দিলেন ঃ 'ওঠো, তোমাকে এখন আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। তোমাকে আমার খুব দরকার...।'

তিতিয়া চিৎকার করে বলতে চাইল, 'না, যাব না! গো টু হেল, ইউ ব্লাডি বাস্টার্ড!' কিন্তু ওর ঠোঁট দুটো খুব সূক্ষ্মভাবে কেঁপে উঠল শুধু। মুখের ভেতরে জিভ আর আলজিভ নিথর হয়ে রইল। ওরা পুরোপুরি 'মাল্‌টিমনোপ্লেজিয়া'-র শিকার হয়েছে।

তিতিয়া শেখরের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

সন্ধের হালকা ছায়া নেমে এসেছে পার্কে। ছেলের দল খেলাধুলো সেরে বাড়ি ফিরছে। পার্কের ল্যাম্পপোস্টের সাদা আলোগুলো জ্বলে উঠেছে নানান জায়গায়। বড়-বড় ঝাঁকড়া গাছগুলোয় পাখিদের তুমুল কিচিরমিচির।

তিতিয়া সবই দেখতে পাচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিল, বুঝতেও পারছিল—কিন্তু তবুও বাধ্য মেয়ের মতো শেখরচন্দ্রের পাশে-পাশে হেঁটে যাচ্ছিল। পার্কের লোকজন ওদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, কারণ, ওরা দুজনে এতটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু যদি কেউ খুঁটিয়ে খেয়াল করত তা হলে দেখতে পেত, তিতিয়ার চোখে পলক পড়ছে না। এবং পলকহীনভাবে তাকিয়ে থাকলে চোখে যে জল কাটে সেরকম কোনও লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না।

তিতিয়া মনে-মনে নানারকম প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের কথা ভাবছিল, কিন্তু সে শুধু মনে-মনেই—তার বেশি কিছু নয়।

শেখর তিতিয়াকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠলেন। তিতিয়াকে ট্যাক্সিতে বসাতে গিয়ে ওঁকে বেশ কসরত করতে হল।

'প্যারালিসিসের পেশেন্ট—' ট্যাক্সি ড্রাইভারের কৌতূহলী চোখকে সামাল দেওয়ার জন্য শেখর বললেন।

ট্যাক্সি আধঘণ্টা মতন চলার পর একটা পুরোনো তিনতলা বাড়ির সামনে এসে থামল। বাড়িটার একদিকে একটা একতলা শিবমন্দির, অন্য-পাশে একটা পেট্রল পাম্প। পেট্রল পাম্পটায় সেরকম কোনও ভিড় নেই—কেমন যেন মলিন দশা।

ট্যাক্সি থেকে নেমে খুব যত্ন নিয়ে তিতিয়াকে ধরে-ধরে নামালেন শেখরচন্দ্র। তারপর ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ঢুকে গেলেন বাড়ির ভেতরে।

বাড়িটা অন্তত সত্তর কি আশি বছরের পুরোনো। ওটার গায়ে কখনও রিপেয়ারের ছোঁয়া লেগেছে বলে মনে হয় না। জানলার রং এককালে সবুজ ছিল। এখন রোদ-জল-বাতাসের ধারাবাহিক অত্যাচারে কালচে কাঠ বেরিয়ে আছে। তবে কোথাও-কোথাও সবুজের আস্তরণ লেগে আছে। জানলার পাল্লায় সাবেকি ধাঁচের খড়খড়ি আর লম্বা-লম্বা লোহার গরাদ। কোনও জানলা দিয়েই আলো চোখে পড়ছে না। দেখে অনেকটা যেন পোড়ো বাড়ি বলে মনে হচ্ছে।

বাড়ির সদর দরজা বন্ধ ছিল। শেখর দত্তগুপ্ত দরজার ডানদিকের ফ্রেমে লাগানো একটা সাদা পুশবাট্‌ন টিপলেন। ভেতরে কোথাও কলিংবেলের শব্দ হল। তারপর—আধমিনিট পরেই—দরজা খুলে গেল।

তিতিয়া হঠাৎই ব্যালান্স রাখতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল, শেখর চট করে ওকে আঁকড়ে ধরে সামলে দিলেন। হেসে বললেন, 'এখন তোমাকে আগলে-আগলে রাখতে হবে—যাতে বডিতে কোথাও চোট

না লাগে। লাগলে আমার প্রোডাক্টে খুঁত থেকে যাবে...।'

'কী প্রোডাক্ট? কীসের খুঁত?' তিতিয়া মনে-মনে নিজেকে প্রশ্ন করল। ওর মনটাই শুধু এখন স্বাধীন রয়েছে—আর কিছু নয়।

খোলা দরজা দিয়ে টিউবলাইটের আলো চোখে পড়ছিল, কিন্তু টিউবলাইটটা দেখা যাচ্ছিল না। সামনের ছোট্ট স্পেসের ডানপাশের কোনও একটা খাঁজ থেকে আলোটা আসছিল।

দরজা খুলেছে চুড়িদার পরা একটি অল্পবয়েসি মেয়ে। বড়জোর উনিশ, কি কুড়ি। এই মেয়েটিই বোধহয় শেখরচন্দ্রের দেখাশোনা আর ফাই-ফরমাশের জন্য 'রাতদিনের মেয়ে'—মৌরী।

মৌরীর গায়ে-মুখে টিউবলাইটের আলো পড়েছিল। তিতিয়া ওকে বেশ মনোযোগেই দেখল।

মাথায় খাটো, রং ময়লা—কিন্তু যৌবনের বিকিরণ ধাক্কা লাগার মতো।

শেখরচন্দ্রকে দেখে মৌরী অভিমানী গলায় বলল, 'এত দেরি হল!'

শেখর মুচকি হাসলেন ঃ 'দেখ, কী জিনিস নিয়ে এসেছি! এ থেকে যা তৈরি হবে সে একেবারে লাজবাব!' তিতিয়ার হাতব্যাগটা মৌরীর হাতে দিয়ে ওর গাল টিপে দিলেন ঃ 'ওঃ! তোর গাল দুটো কী নরম!'

মৌরী চোখের ইশারা করে বলল, 'শুধু গাল?'

শেখর কেমন যেন হেঁচকি তুলে হাসলেন। তারপর তিতিয়ার দিকে একপলক তাকিয়ে মৌরীকে বললেন, 'তুই আমার ''রাতদিনের মেয়ে''। তবে দিনে কম, রাতে বেশি...।' কথা বলতে-বলতে ভেতরে ঢুকছিলেন শেখর। মৌরী সদর দরজাটা বন্ধ করে ভেতর থেকে খিল এঁটে দিল। তারপর শেখরের প্রায় গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

মৌরীর গা থেকে বিচিত্র এক গন্ধ বেরোচ্ছিল। খানিকটা ঘামের গন্ধ, খানিকটা তেজপাতার গন্ধ, আর তার সঙ্গে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ মেশানো। তিতিয়া সেই গন্ধ পাচ্ছিল। দেখল, শেখরচন্দ্র বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছেন। তিতিয়ার মনে হল, বৃদ্ধ পুরুষটা যেন প্রাণভরে মৌরীর গন্ধ শুঁকতে চাইছে।

মৌরীর হাতে ধরা নিজের হাতব্যাগটার দিকে তেষ্টার চোখে তাকাল তিতিয়া। ইস্, যদি ওর ক্ষমতা থাকত তাহলে শরীরসর্বস্ব মেয়েটার গালে এক থাপ্পড় মেরে ব্যাগটা কেড়ে নিত। তারপর ব্যাগ থেকে নিজের মোবাইল ফোনটা বের করে 'অন' করত। তারপর...তারপর...রীতেশকে...হ্যাঁ, রীতেশকে একটা ফোন করত। না, রীতেশের ওপরে ওর আর একটুও রাগ নেই। রীতেশ খুব ভালো। আই লাভ ইউ, রীতেশ। আই লাভ ইউ, লাভ ইউ অ্যান্ড লাভ ইউ...।

তারপর ফোন করত মা-কে। তারপর বাবাকে।

এইসব অসম্ভব কথা ভাবছিল তিতিয়া। দুঃখ আর কষ্টে ওর বুকটা ফেটে যেতে চাইছিল। কিন্তু ও চুপটি করে ছবির মতো দাঁড়িয়েছিল শেখরচন্দ্রের পাশে। আর শেখরচন্দ্র তখন উষ্ণতা আর আবেগ মিশিয়ে মৌরীর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমু খাচ্ছিলেন। চুমু খাচ্ছিলেন...চুমু খাচ্ছিলেন....।

একটু পরে শেখর আর মৌরীর ছাড়াছাড়ি হল। শেখরের লালায় মৌরীর ঠোঁট চকচক করছে। সেইসঙ্গে চোখজোড়াও কাচের মার্বেলের মতো চকচক করছে।

শেখর ওকে বললেন, 'চল, একে এবার ল্যাবে নিয়ে যাই...।'

সঙ্গে-সঙ্গে মৌরী তিতিয়ার ডানপাশে চলে এল, আর শেখরচন্দ্র চলে এলেন বাঁ-পাশে। ওরা তিতিয়ার হাতের ডানা ধরে ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললেন বাড়ির একেবারে পিছনদিকে—কারণ, শেখরের ল্যাবরেটরিটা সেখানেই আছে।

সরু অলিন্দ ধরে যেতে-যেতে তিতিয়ার মনে হচ্ছিল, ওটা অলিন্দ নয়, কোনও অ-শেষ সুড়ঙ্গ। ও যেন কোথায় ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে পৌঁছোল ওরা।

ল্যাব দেখে তিতিয়া চমকে গেল। আলো আর যন্ত্রপাতিতে একেবারে চোখ-ধাঁধানো ল্যাব। ঘরের দেওয়ালে সিলিং-এর কাছ বরাবর লাগানো রয়েছে বেশ কয়েকটা স্প্লিট এসি মেশিন। তাদের কল্যাণে ঘরটা বেশ ঠান্ডা।

ঘরের একপাশে একটা বড় টেবিল। টেবিলের একদিকে একটা রিভলভিং চেয়ার, আর তার বিপরীতে তিনটে আধুনিক চেয়ার। টেবিলের ওপরে দুটো ল্যাপটপ, কাগজপত্রের চারটে ফাইল, আর বেশ কয়েকটা রঙিন পেন, প্যাড আর বই ছড়িয়ে রয়েছে।

তিতিয়াকে একটা চেয়ারে বসাল দুজনে।

বসার সময় তিতিয়া হালকাভাবে টের পেল, ওর দু-চোখের ভেতরে কেমন যেন সুড়সুড় করছে। তখনই ও বুঝতে পারল, ও চোখের মণি খুব সামান্য হলেও ডাইনে-বাঁয়ে নড়াতে পারছে।

ল্যাবে বেশ কয়েকটা বড়-বড় যন্ত্র রয়েছে। তার মধ্যে একটা হল প্রকাণ্ড মাপের গদি-মোড়া একটা চেয়ার। সেটাকে ঘিরে দুটো প্যানেল, নানান রঙিন তার, মিটার আর কয়েকটা ছোট-ছোট গ্যাজেট লাগানো। এ ছাড়া সব ক'টা যন্ত্রের সঙ্গেই হুক-আপ করা রয়েছে দুটো কি তিনটে ডেস্কটপ কম্পিউটার।

রিভলভিং চেয়ারটায় শরীর এলিয়ে বসে পড়লেন শেখরচন্দ্র। 'ফোঁস্‌স্' শব্দ করে দম ছাড়লেন। মৌরীকে বললেন, 'তুই তিতিয়ার কাছে বোস। এখান থেকে ওকে তুলে তো ''ফ্রিজিং চেয়ার''-এ বসাতে হবে। বসানোর পর ওকে আবার ট্রিটমেন্ট করে রেডি করতে হবে...।'

'ফ্রিজিং চেয়ার' বলার সময় শেখর যে গদিমোড়া প্রকাণ্ড চেয়ারটার দিকে আঙুল দেখিয়েছেন সেটা তিতিয়ার নজর এড়াল না। কিন্তু ও বুঝতে পারছিল না যে, শেখর ওকে নিয়ে ঠিক কী করতে চান। টাকাপয়সা যে উনি চান না সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে!

তিতিয়া পালা করে শেখর আর মৌরীকে দেখছিল। শেখরকে এখন আর ততটা বৃদ্ধ মনে হচ্ছিল না। তিনি এখন টেবিলের কাগজপত্র আর একটা ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ওঁর হাবভাব দেখে এখন অনেকটা সায়েন্টিস্ট-সায়েন্টিস্ট লাগছিল।

'হ্যাঁ, এইবার...' এই কথা বলে কম্পিউটার থেকে মুখ তুললেন শেখরচন্দ্র। তিতিয়ার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে হাসলেন ঃ 'তিতিয়া, এবার তোমাকে

কয়েকটা ইম্‌পর্ট্যান্ট কথা বলি। তুমি হয়তো তখন থেকে ভাবছ, তোমাকে এখানে আমি নিয়ে এলাম কেন।' চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলেন শেখর। চশমাটা নাকের ওপরে একটু নেমে এসেছিল—সেটাকে ঠিক করে বসালেন। তারপর ঃ 'শোনো, মা-মণি...এতক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, "ম্যাকমিলান্‌'স সিনড্রোম" নামে কোনও অসুখ নেই। আর এটাও বোধহয় বুঝতে পেরেছ, "সি-টক্স-এফ" নামে কোনও ট্যাবলেট নেই। তবে "থায়াটোমিন-টি. এস." নামে ইন্‌জেকশানটা সত্যি-সত্যি আছে। আর ওটা শরীরে নিলে কী হয় সেটা তুমি এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছ। এখানে আরও একটা কথা বলি... এই ইন্‌জেকশানটা কোনও দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না, বিকজ এটা আমার তৈরি।

'আমি বেসিক্যালি একজন ডাক্তার—ডক্টর অফ মেডিসিন। তার ওপরে আমার বায়োটেকনোলজির ডিগ্রি আছে। লাস্ট পঁয়তিরিশ বছর ধরে আমি বায়োটেকনোলজি, আর তার ওপরে মেডিসিনের নানান এফেক্ট নিয়ে রিসার্চ করি। আমি ইউ. এস. এ.-তে আঠেরো বছর ছিলাম। সেখানে ক্যালটেক আর স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কাজ করেছি। আমার মোর দ্যান হান্ড্রেড রিসার্চ পেপার যেমন আছে, তেমনই আছে তেইশটা পেটেন্ট। এসব তোমাকে বলার মানে এটা বোঝানো যে, আমি মোটেই এলি-তেলি সায়েন্টিস্ট নই। ইউ শুড বি ইমপ্রেস্‌ড, তিতিয়া।'

তিতিয়ার সজীব চোখ শেখরচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইল অপলকে।

মৌরীর দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে তিনি বললেন, 'আমি সবসময় আমার রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি নিয়ে বিজি থাকি, তাই মৌরী আমার দেখাশোনা করে, আমার যৌবনকে সামলায়। হ্যাঁ, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তিতিয়া, আমার সেক্স ড্রাইভটা সুপারড্রাইভ কি হাইপারড্রাইভের মতো। হয়তো আমি সুপারক্রিয়েটিভ বলেই। এনিওয়ে...লেট আস কাম ব্যাক টু সায়েন্টিস্ট শেখরচন্দ্র দত্তগুপ্ত—এস. সি. ডি.।

'আমার এই ল্যাবটা হাইলি অটোমেটেড। এটা আমি অনেক পয়সা আর পরিশ্রম খরচ করে লাস্ট চারবছর ধরে তৈরি করেছি। এটা আসলে ঠিক ল্যাব নয়, তিতিয়া—এটা একটা সফিস্টিকেটেড প্রোডাকশন ইউনিট। এখানে যে-প্রোডাক্ট তৈরি হয় সেটা পৃথিবীর আর কোথাও তৈরি হয় না।' মজা করে হাসলেন শেখর। ওপর-নীচে মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, 'সেইজন্যেই আমার প্রোডাক্টের এত কদর, এত দাম। জানি, তুমি যদি এখন কথা বলার মতো অবস্থায় থাকতে তা হলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে "কী প্রোডাক্ট তৈরি করেন আপনি?" কিন্তু ব্যাড লাক। তাই আমিই তোমাকে এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে দিচ্ছি। এখানে মানুষকে আমি চিরযৌবন দান করি। আর এই দানের কাজটা করি খুব প্রাইভেটলি। এবং লিমিটেড স্কেলে। তাই একসময় ভেবেছিলাম, আমার কোম্পানির নাম রাখব "চিরযৌবন প্রাইভেট লিমিটেড"...' কথা থামিয়ে জোরে হেসে উঠলেন শেখর। ওঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে মৌরীও হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে শেখর দু-হাতের একটা ভঙ্গি করে বললেন, 'কিন্তু, বুঝতেই পারছ, ওরকম গডি বা লুরিড নাম তো দেওয়া যায় না, তাই ফাইনালি আমি নাম দিয়েছি "সুপারডল্‌স"। কী, নামটা ভালো হয়নি?'

তিতিয়া চুপচাপ তাকিয়ে রইল শেখরের দিকে। মনে-মনে ও ভাবছিল, শেখরের কোম্পানি কি তা হলে পুতুল তৈরি করে? যদি তাই হয়, তা হলে সেই পুতুল তৈরিতে তিতিয়া কোন কাজে লাগবে?

তিতিয়ার এসব প্রশ্নের উত্তর দিলেন শেখর নিজেই।

'নামের মধ্যে "ডল" ওয়ার্ডটা শুনে ভেবো না, আমি পুতুল তৈরি করি। আমি যেটা তৈরি করি তাকে ইংরেজিতে বলে "ম্যানিকিন"। এই ওয়ার্ডটা তুমি নিশ্চয়ই জানো, বিকজ তোমার সাবজেক্ট ইংলিশ...।'

তিতিয়া মনে-মনে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। হ্যাঁ, শব্দটার মানে ও জানে। শাড়ি-জামা-কাপড়ের দোকানের শো-কেসে মানুষের ছাঁচে তৈরি যেসব মডেল সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে সেইসব মডেলকে বলে ম্যানিকিন। শুধু শাড়ি বা জামাকাপড়ের দোকান কেন, গয়নার দোকান, জুতোর দোকান, স্পোর্টস গিয়ারের দোকান, চশমার দোকান—এরকম বহু দোকানের শো-কেসেই ম্যানিকিন দেখেছে তিতিয়া।

'নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরির মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে প্রথম ফ্যাশন ম্যানিকিন তৈরি হয়। সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল কাগজের মণ্ড থেকে। তারপরে একসময় ফুল সাইজের ম্যানিকিন—দেখতে একেবারে মানুষের মতো—তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। ওগুলো যাতে দেখতে হুবহু মানুষের মতো হয় তার জন্যে ম্যানিকিন আর্টিস্টরা মোম ব্যবহার করত। কিন্তু মোমের ম্যানিকিন মোটেই টেকসই হত না। আজ আঙুল ভাঙছে তো কাল নাক ভাঙছে, নয়তো হাত কিংবা পা। তখন, মোটামুটি ১৯২০-র দশকে, এল প্লাস্টার মিশিয়ে তৈরি অনেক বেশি টেকসই একটা কম্পোজিট মেটিরিয়াল।

'আর এখন?' হাসতে-হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শেখরচন্দ্র ঃ 'এখন ম্যানিকিন তৈরি হয় হরেক জিনিস দিয়ে—তার মধ্যে মেজর হল প্লাস্টিক আর ফাইবারগ্লাস, অথবা ফাইবারগ্লাস রেইনফোর্স্‌ড প্লাস্টিক। ফাইবারগ্লাসের ম্যানিকিনের খরচ প্লাস্টিকের চেয়ে বেশি, তবে ওগুলো প্লাস্টিকের ম্যানিকিনের মতো অত শক্তপোক্ত নয়।'

কথা বলতে-বলতে পায়চারি করছিলেন শেখর। পায়চারি করতে-করতে টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে চলে এলেন মৌরীর কাছে। কয়েক সেকেন্ড ওর শরীরকে জরিপ করার পর তিতিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুরুর দিকে যেসব ফিমেল ম্যানিকিন তৈরি হত সেগুলোর বুকের সাইজ ছিল ছোট, কিংবা বড়জোর অ্যাভারেজ। কিন্তু মডার্ন ম্যানিকিন আর্টিস্টরা সেক্সি ভলাপচুয়াস ফিমেল ম্যানিকিন তৈরি করা শুরু করল। মানে, সরু কোমর, অথচ বুকজোড়া বেশ ভারী। যাকে আর কি দুধেল বুক বলে। এই যে, মৌরীর মতন...।' হঠাৎই হাত বাড়িয়ে মৌরীর বাঁ-দিকের বুকের নীচে হাত রাখলেন। হাতটা আলতো করে দুবার নাচিয়ে যেন বুকের ওজন পরখ করতে চাইলেন।

মৌরী খিলখিল করে হেসে শরীরটা সাপের মতো এদিক-ওদিক মোচড়াল। শেখরের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বলল, 'ওঃ, রস একেবারে ঝরে পড়ছে!'

শেখর রসালো হাসি হেসে তিতিয়ার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তিতিয়ার শরীর ঘিনঘিন করছিল। শেখরচন্দ্রের দেওয়া নিজের পরিচয় যদি সত্যি হয়, তা হলে তিনি বিশাল পণ্ডিত এবং বিদ্বান। কিন্তু তাঁর এ কী অদ্ভুত অ্যাবারেশান! বিকৃতকাম লোকটা এবার তিতিয়ার শরীরের যেখানে-সেখানে হাত দেবে না কি! কিন্তু দিলেও তো তিতিয়ার কিছু করার নেই। ওকে সেই অসভ্যতা সহ্য করতে হবে। ইস্‌, কেন যে ও হাত-পা একটুও নাড়াতে পারছে না কে জানে! ওঃ, ভগবান!

না, শেখরচন্দ্র তিতিয়ার শরীরের যেখানে-সেখানে হাত দিলেন না। ওর বুকে নয়, চিবুকে আঙুল ছোঁয়ালেন শুধু। তারপর আঙুলের উলটোপিঠ গালে বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'প্লাস্টার, প্লাস্টিক, ফাইবারগ্লাস—যে-কোনও জিনিস দিয়েই তৈরি করা হোক না কেন, ম্যানিকিনগুলোর একটা মেজর ডিফেক্ট রয়ে গেছে। সেটা হল হিউম্যান বডির মিসিং সফ্‌টনেস। হাজার চেষ্টা করেও ম্যানিকিন আর্টিস্টরা এটা নকল করতে পারেনি। কেউ-কেউ স্পেশাল টাইপের পলিমার দিয়ে ম্যানিকিন তৈরি করে এই সফ্‌টনেস আনার চেষ্টা করেছে—বাট, হয়নি। কোনও-কোনও আর্টিস্ট বেলুনের মতো ফাঁপা ম্যানিকিন ডিজাইন করার চেষ্টা করেছে, বাট সেটাও ফেইল করেছে।'

তিতিয়ার কাছ থেকে সরে এলেন। বেশ গম্ভীরভাবে ওপর-নীচে মাথা নাড়লেন কয়েকবার। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'সফ্‌টনেস। সফ্‌টনেস। সফ্‌টনেস...।' তারপর মুখ তুলে তাকালেন মৌরীর দিকে আর তিতিয়ার দিকে ঃ 'ফিমেল ম্যানিকিনের সফ্‌টনেসটা হল আরও সমস্যার। কারণ, ওদের বডির সফ্‌টনেস একরকম, আর প্রাইমারি অ্যাট্রাক্টরের সফ্‌টনেস হল আর-একরকম...।'

'প্রাইমারি অ্যাট্রাক্টর?' মনে-মনে নিজেকেই প্রশ্ন করল তিতিয়া। দেখল মৌরী



শেখরচন্দ্র তখন উষ্ণতা আর আবেগ মিশিয়ে...

শেখরের দিকে চোখ টেরিয়ে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

শেখরচন্দ্রও পালটা হেসে মাথা নাড়লেন, বললেন, 'হুঁ...হুঁ... প্রাইমারি অ্যাট্রাক্টর। মানে, মেয়েদের বুক।' মৌরীর চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরলেন ওর দু-গাল। গালে হাত ঘষে-ঘষে বোধহয় কোমলতা মাপলেন। তারপর ওঁর হাত-দুটো গাল বেয়ে-বেয়ে নামল গলায়। গলা থেকে নীচে, আরও নীচে...।

তিতিয়া চোখ বুজতে চাইল, কিন্তু ওর চোখের কোনও পেশিই কাজ করল না। ওকে দেখতে হল যে, শেখরচন্দ্রের দুটো হাত দুটো ফণা ছড়ানো গোখরো সাপের মতো ধীরে-ধীরে মৌরীর কামিজের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

'সফ্‌টনেস। প্রাইমারি অ্যাট্রাক্টর। মানে, মেয়েদের বুক। ওগুলোর সফ্‌টনেস ফিমেল ম্যানিকিনে ক্রিয়েট করাটা ভীষণ কঠিন। তা ছাড়া মেয়েদের বডি একটা দারুণ রহস্যময় ব্যাপার—নানা জায়গায় সফ্‌টনেস তার নানানরকম।' শেখরচন্দ্রের দু-হাতের তালু তখন তাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছে এবং সফ্‌টনেসের ডিগ্রি মাপার ডেমো দিচ্ছে।

'কোনও জ্যান্ত যুবতীর শরীরের সফ্‌টনেসের ভ্যারিয়েশানের যা ম্যাপ সেটাকে কোনও ফিমেল ম্যানিকিনে রিক্রিয়েট করাটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। সারা পৃথিবীতে আমিই একমাত্র মানুষ যে এই চ্যালেঞ্জটার একটা মুখের মতন জবাব দিতে পেরেছে...।'

মৌরীর দু-চোখ আদরের আবেশে বুজে এসেছে। ঘন শ্বাস পড়ছে বারবার। চিবুকটা তুলে আছে ওপরদিকে।

একটু পরে গোখরো সাপের ফণাদুটো বেরিয়ে এল কামিজের বাইরে। হাতে হাত ঘষলেন শেখর। তিতিয়ার কাছে এলেন। ঝুঁকে পড়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'তোমাকে দিয়ে আমি একটা ফিমেল ম্যানিকিন তৈরি করব। সেইজন্যেই তোমাকে পার্ক থেকে ধরে নিয়ে এসেছি।' তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শূন্যে একটা আঙুল উঁচিয়ে শাসনের ভঙ্গিতে বললেন, 'তিতিয়া, তুমি খুব লাকি যে পৃথিবীর সেরা ম্যানিকিন আর্টিস্টের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। আর তার হাতের কারিকুরিতে তুমি অমর হয়ে থাকবে। তোমার এই দুরন্ত যৌবন চিরস্থায়ী হবে। এই পৃথিবীর কোনও এক দেশে কোনও এক শো-রুমে তুমি লিভিং ডেড মডেল হয়ে থেকে যাবে।

তোমাকে ঘিরে ঘুরে বেড়াবে ফ্যাশনেব্‌ল বড়লোকের দল। তারা তোমাকে টাচ করবে—যেখানে-সেখানে। কারণ, বিদেশে এই টাচ-ফাচ করার ব্যাপারে সব তরফের পাবলিকরাই দারুণ লিবারাল।

'তোমাকে টাচ করে তারা অবা-ক হয়ে যাবে, তিতিয়া। কারণ, তোমার বডির ন্যাচারাল সফ্‌টনেস। তারা হতবাক হয়ে ভাববে, এই জীবন্ত ম্যানিকিন তৈরি হল কেমন করে? কে তৈরি করল এই আশ্চর্য ম্যানিকিন?' বুকে ডানহাত ঠুকলেন শেখরচন্দ্র : 'কে আবার? আমি! ডক্টর শেখরচন্দ্র দত্তগুপ্ত! দ্য ওনলি সুপার-সায়েন্টিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড!'

মৌরী শেখরের গায়ে হাত দিয়ে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল : 'কী হচ্ছে? এত এক্সাইটেড হচ্ছ কেন?'

শেখর মৌরীর দিকে তাকালেন এবং পলকে শান্ত হলেন। ওঁর গালের লাল আভা মিলিয়ে যেতে লাগল। যথেষ্ট শান্ত গলায় বললেন, 'এক্সাইটেড হব না, বল? আর কেউ পেরেছে এরকম আবিষ্কার করতে? কেউ না!'

শেখর তিতিয়ার চোখে সরাসরি চোখ রাখলেন : 'তিতিয়া, যে-ম্যানিকিন আমি তৈরি করি তার এক-একটা সত্তর কি আশি লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। ইউ ওন্ট বিলিভ ইট। আর যে টেকনিকে আমি এই স্পেশাল ম্যানিকিন তৈরি করি সংক্ষেপে তার নাম হল "লো টেম্পারেচার ওজোন অসমোসিস"। খুব লো টেম্পারেচারে ওজোন গ্যাসকে তোমার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তারপর অসমোসিস প্রসেসে—মানে, অভিস্রবণে সেই ওজোন গ্যাস তোমার শরীরের কোশে-কোশে ছড়িয়ে পড়বে...।'

তিতিয়া রীতেশের কথা ভাবছিল। ছেলেটা খুব ভালো। সরল। সোজাসাপটা। তিতিয়া হঠাৎ কেন যে ওর ওপরে অমন খেপে গেল কে জানে! ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না, এ-কথা ভাবতেই তিতিয়ার বুক ঠেলে কান্না উঠে আসছে। কিন্তু সে-কান্না বেরোতে পারছে কই! ওর দু-চোখের ভেতরে কেমন যেন সুড়সুড় করে উঠল আবার। যেহেতু শেখর এখন ওর দিকে তাকিয়ে আছেন তাই ও চোখের মণি নড়াতে চেষ্টা করল না। ওর চোখের ভেতরটা জ্বালা-জ্বালা করে উঠল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি চোখের জল বেরিয়ে আসবে। রীতেশের সঙ্গে কাটানো খুব সুন্দর-সুন্দর সময়গুলোর কথা তিতিয়ার মনে পড়ছিল।

একবার ওর বাঁ-চোখে ধুলোর কণা কিংবা ওইরকম কিছু একটা পড়েছিল। সেটা চোখ থেকে বের করে ওকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য রীতেশ কীরকম পাগলের মতো করছিল সেটা ওর স্পষ্ট মনে আছে। শেষ পর্যন্ত চোখের পাতা টেনে সরিয়ে চোখে ফুঁ দিয়ে-দিয়ে রীতেশ সাক্‌সেসফুল হয়েছিল। তা ছাড়া ওই ফুঁ দেওয়ার সময় রীতেশ একবার ওর ভুরুর ওপরে চুমু খেয়েছিল। সেই চুমুটা তিতিয়ার খুব মিষ্টি লেগেছিল। ওঃ, রীতেশ, তুমি এখন কোথায়? কোথায় তুমি?

তিতিয়ার ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। কেন যে ও রাগ করে মোবাইলটা সুইচ অফ করতে গেল! যদি ও রীতেশকে একটিবার বলতো ও কোন পার্কে আছে তা হলে ফোন সুইচ অফ করে দিলেও রীতেশ নির্ঘাত সেখানে ওর খোঁজ করতে আসত। ওকে ওই পার্কে খুঁজে না পেলে রীতেশ অফকোর্স থানা-পুলিশ করত। তারপর...তারপর... তিতিয়ার বাড়িতে খবর দিত। শেষ পর্যন্ত তিতিয়াকে রীতেশ এই পারভারটেড পাগল বুড়ো সায়েন্টিস্টটার খপ্পর থেকে রেসকিউ করত। আর এই বুড়োটাকে যা দিত না, তাতে এই বুড়োর সায়েন্টিস্টগিরি 'আপ ইয়োর্স' হয়ে যেত!

তিতিয়া মনে-মনে অনেক কিছু ভাবল, কিন্তু ওই ভাবা পর্যন্তই। দুঃখে কষ্টে ওর চোখ ফেটে জল বেরোতে চাইল, কিন্তু বেরোল না। চোখের ভেতরটা একটু কড়কড় করে উঠল শুধু। তিতিয়া নিষ্পলকে শেখরচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মা-বাবার কথা মনে পড়তে লাগল বারবার। ওঁরা যে কী দারুণ ভালোবাসেন ওঁদের একমাত্র মেয়েকে সেটা বলে বোঝানো যাবে না। তিতিয়া ওঁদের 'নীলমণি' মেয়ে। মা কিংবা বাবা ওকে একমুহূর্তও চোখের আড়াল করতে চান না। অথচ এখন? আজ রাতের পর তিতিয়াকে ওঁরা আর কোনওদিনও দেখতেই পাবেন না!

'ওজোন অসমোসিসে কী হবে জানো?' তিতিয়ার সামনে এসে হাত নেড়ে বোঝাতে শুরু করলেন শেখরচন্দ্র। কপালে হাত ঘষলেন কয়েকবার। মুচকি হেসে বললেন, 'তোমার শরীরটা শীতঘুমে চলে যাবে। হাইবারনেশান। সাপের মতো। না, না—ঠিক সাপের মতো নয়—বরং স্টারশিপে করে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া কস্‌মোনটদের মতো। তাদের বডি ফাংশান চলতে থাকবে—ভেতরে-ভেতরে ফল্গু নদীর মতো। অন্তঃসলিলা। ওজোন অসমোসিসের পর, তিতিয়া, তুমি ঠিক সেরকম হয়ে যাবে। দ্য লিভিং ডেড। আনরটিং ডেডবডি। বাট স্টিল দ্য মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড বিউটিফুল ফিমেল ম্যানিকিন। আ ফ্যানট্যাস্টিক ক্রিয়েশান অফ ডক্টর শেখরচন্দ্র দত্তগুপ্ত। দ্য গ্রেটেস্ট ম্যানিকিন আর্টিস্ট!'

ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে দু-হাত ওপরে তুলে 'হা-হা' করে হেসে উঠলেন শেখর। কিছুক্ষণ পর হাসি থামলে বললেন, 'চলো, তিতিয়া—ইট্‌স টাইম। এবার তোমাকে ফ্রিজিং চেয়ারে বসানোর সময় হয়েছে।' মৌরীর দিকে তাকালেন : 'মৌরী, নে ওঠ, রেডি হ—। এবার একে ধরে ওই চেয়ারে বসাতে হবে।'

মৌরী উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। তারপর ও আর শেখর মিলে তিতিয়াকে চেয়ার থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। ঝুঁকে পড়ে ওর পা থেকে জুতো খুলে দিল মৌরী। এবং ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ফ্রিজিং চেয়ারের দিকে।

'তিতিয়া, আমার তৈরি ফিমেল ম্যানিকিন পৃথিবীর তাবড়-তাবড় সব ফ্যাশান আউটলেটে যায়। সেখানে মৌমাছির মতো শুধু জঘন্য বড়লোকদের ভিড়। তারা শুধু যে ফিমেল ম্যানিকিনের গায়ে পরানো পোশাক পরখ করে দ্যাখে তা নয়—ম্যানিকিনের বডির নানান অংশের মাপজোখও পরীক্ষা করে দ্যাখে। টিপে-টুপে দ্যাখে ড্রেসটা ম্যানিকিনের গায়ে কতটা ফিট করেছে...।'

শেখরের একঘেয়ে বক্তৃতা শুনতে-শুনতে তিতিয়ার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। ও বেশ বুঝতে পারছিল, এটাই ওর শেষ ঘুম পাওয়ার ফিলিং। ওর শরীরের ওপরে নানান ট্রিটমেন্টের ঝড়

বয়ে যাওয়ার পর 'ঘুম-ঘুম পাচ্ছে' এই ফিলিংটা ওর আর থাকবে না।

ওর যাতে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে সেজন্য মা ওর চুলের মধ্যে আলতো করে আঙুল চালিয়ে বিলি কেটে দিত। ও যে বড় হয়ে গেছে সে-কথা বললেও মা পাত্তা দিত না। বলত, 'তুই চুপ কর তো! মায়ের কাছে মেয়ে কখনও বড় হয় না।'

আর বাবা! চেষ্টা করেও তিতিয়া কখনও বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেনি। তিতিয়ার ব্যাপারে—সেই ছোটবেলা থেকেই—বাবার মুখে কখনও 'না' নেই। তিতিয়াকে বাবা আদর করে 'তুতি' বলে ডাকত। তুতি কখনও কোনও জিনিস চাইলে সেটা কতক্ষণে ওর সামনে এনে হাজির করবে সে-কথা ভেবে বাবা পাগলের মতো হয়ে যেত। ছোটবেলাতেও যেমন, এখনও তেমন।

এই তো কিছুদিন আগে ওকে বত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছে বাবা। মোবাইলের বিজ্ঞাপন বাবাকে দেখিয়ে বায়না করামাত্রই।

তিতিয়ার চোখে জল এসে গেল। ওকে হারিয়ে মা আর বাবা তো স্রেফ পাগল হয়ে যাবে!

ওকে বেশ যত্ন করে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে দুজনে। তারপর শেখর অনেকগুলো সুইচ অন করতে লাগলেন। কয়েকটা মেটাল পাইপের ভাল্‌ভ খুলে দিলেন। একটা প্যানেলের দুটো ডায়াল ঘোরানোর ইনস্ট্রাকশন দিতে লাগলেন মৌরীকে।

'তিতিয়া!' বেশ একটু চেঁচিয়ে ওকে ডাকলেন শেখর, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? প্রথমে তোমাকে প্লাজ্‌মা ট্রিটমেন্ট করা হবে। তারপর দু-পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগায় হাই ভোল্টেজ শক অ্যাপ্লাই করা হবে। পরপর দশবার। না, না, কোনও ভয় নেই! তুমি এই শকে মরবে না। কারণ, এই শকগুলো হাইভোল্টেজের হলেও এগুলোর ডিউরেশান মাত্র থার্টি মাইক্রোসেকেন্ড। সো তোমার কিস্যু হবে না। আরে বোকা, তোমার কিছু হলে তো আমার লস্‌!' মৌরীর দিকে তাকিয়ে ওকে তাড়া দিলেন, 'মৌরী, তাড়াতাড়ি কর! হাই ভোল্টেজ সাপ্লাইয়ের মাইক্রো-সুইচটা ''অন'' করে দে—।'



মৌরীর হাত খুব চটপট কাজ করছিল। শেখরের তাড়া খেয়ে হাত দুটো তাদের কাজের স্পিড আরও বাড়িয়ে দিল। 'ফ্রিজিং চেয়ার'-এর উচ্চতা খুব বেশি নয়। তাই তিতিয়ার পা দুটো মেঝেতে টাচ করে আছে। যেখানে টাচ করে আছে সেখানে কাছাকাছি বসানো রয়েছে তামার তৈরি দুটো চৌকো প্লেট। প্লেটের ঠান্ডা ভাব টের পাচ্ছিল তিতিয়া। সেই ঠান্ডা যেন ওর পায়ের শিরা-উপশিরা বেয়ে শরীরের ওপরদিকে উঠছিল।

তিতিয়া ওর পায়ের দিকে তাকাতে চেষ্টা করল। ওর চোখের মণি সামান্য নড়ল। শেখর কিংবা মৌরী সেটা খেয়াল করল না। কারণ, ওরা তখন কম্পিউটার মনিটর, কিবোর্ড, নানান সুইচ আর তারের কানেকশান-ফানেকশন চেক করতে ব্যস্ত।

তিতিয়া বেশ কষ্ট করে নিজের পায়ের পাতা দেখতে পাচ্ছিল। দেখতে পাচ্ছিল কপারের প্লেট দুটোও। ও বেশ বুঝতে পারছিল, হাই ভোল্টেজ সাপ্লাইয়ের মাইক্রো-সুইচ 'অন' করলেই ওই প্লেট দুটোর মধ্যে পলকে হাই ভোল্টেজ এসে হাজির হবে। এবং তিতিয়ার খালি পা প্লেট দুটোতে লেপটে আছে বলে ভোল্টেজটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তিতিয়ার শরীরে। তারপর...।

তিতিয়ার চোখের ভেতরটা জ্বালা করে উঠল। ওর চোখের প্রেশার হাই। তাই ডক্টরের কাছে ট্রিটমেন্ট চলছে। ডক্টর ওর জন্য দু-দুটো আই ড্রপ প্রেসক্রাইব করেছেন ঃ 'অপ্টিভ' আর 'মেগাব্রম'। ওকে রোজ এই ড্রপ চোখে দিতে হয়।, কে জানে, হয়তো এই আই ড্রপগুলোর জন্যই শেখরের ড্রাগ তিতিয়ার শরীরে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করেনি! তিতিয়া চোখের মণি নড়াতে পারছে, ওর চোখে জল তৈরি হচ্ছে।

শেখর আর মৌরী নিজেদের মধ্যে কলকল করে কথা বলছিল। ওদের চোখ উল্লাসে চকচক করছিল।

শেখর মৌরীকে বললেন, 'ওর পায়ের তলায় রাবার প্যাড ফিট করে দে। যাতে হাই ভোল্টেজ সাপ্লাইয়ের সুইচ ''অন'' করলেও মেয়েটার শক না লাগে। প্লাজ্‌মা ট্রিটমেন্টের পর আমি বললে পর তুই ওর রাবার প্যাড সরিয়ে কপার প্লেটে ওর পা দুটো টাচ করিয়ে দিবি। তারপর ফাইনাল শক ট্রিটমেন্ট।'

কথা শেষ করেই শেখর একটা অদ্ভুত চেহারার পাম্প নিয়ে তিতিয়ার সারা গায়ে স্প্রে করতে লাগলেন। যেটা স্প্রে করা হচ্ছিল সেটা হালকা ধোঁয়ার মতো। তিতিয়ার ঠান্ডা লাগছিল। সেইসঙ্গে একটা মিষ্টি গন্ধ। ঘরটা ম-ম করছিল।

শেখরদের অজান্তে ওর চোখ থেকে টপটপ করে দশ-বারো ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। তামার প্লেট দুটোর মাঝখানে। তারপর সেই জলের সরু রেখা লিকলিকে কেন্নোর মতো গড়িয়ে যেতে লাগল দু-দিকের তামার প্লেটের দিকে।

একটু পরে তিতিয়ার অশ্রুজলের রেখা তামার প্লেট দুটো ছুঁয়ে ফেলল।

আর তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শেখর মৌরীকে বললেন, 'নে, এবার মাইক্রো-সুইচটা একবার ''অন'' কর। রাবার প্যাডের ইনসুলেশান ঠিকঠাক কাজ করছে কি না দেখি...।'

শেখরের নির্দেশ মতো হাই ভোল্টেজের মাইক্রো-সুইচটা মৌরী 'অন' করে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে তিতিয়ার চোখের জল দুটো তামার প্লেটকে শর্ট করে দিল।

হাই ভোল্টেজের শর্ট সার্কিটে চোখ-ধাঁধানো সাদা আলো ঝলসে উঠে ঘরের সবাইকে পলকের জন্য অন্ধ করে দিল।

তারপরই বুক-কাঁপানো বিস্ফোরণের শব্দ —পরপর দুবার। এবং শেখরচন্দ্রের পুরোনো বাড়িটা থরথর করে কেঁপে উঠে সাতটুকরো হয়ে ধসে পড়ল।

ওরা তিনজন ক'টুকরো হয়ে গেল কে জানে! ❑